বাংলা আকাদেমি (শিশুসাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার), ২০১০—নব দিগন্ত প্রকাশনী (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড), পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ (মৌলানা আজাদ পুরস্কার) এবং ২০১১—২৪ ঘণ্টা অনন্য সম্মান। এই তালিকায় কিছু কিছু বছর ছাড় আছে, সেগুলিতেও পুরস্কার থাকার খুবই সম্ভাবনা। কারণ, তখন এমন অবস্থা যে ওঁকে পুরস্কৃত বা সংবর্ধিত করে বহু সংস্থা নিজেরাই সম্মানিত হতে চাইছে। এর সঙ্গে বছরের উল্লেখ ছাড়াই আরও দুটি পুরস্কার যোগ হবে—বিভূতিভূষণ পুরস্কার এবং সুশীলা দেবী বিড়লা পুরস্কার। উপরের সব ক-টি পুরস্কারের মধ্যে অর্থমূল্যের কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেটি দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবন রূপায়ণের জন্য ওঁরা চারজন লেখককে দশ লাখ টাকা করে পুরস্কার দিয়েছিলেন। সিরাজ পেয়েছিলেন তাঁর *অলীক মানুষ* উপন্যাসের জন্য। অন্যদের মধ্যে আবুল বাশার ফুলবউ উপন্যাসের জন্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* উপন্যাসের জন্য এবং গৌরকিশোর ঘোষকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল *প্রেম নেই* উপন্যাসের জন্য। একটি অমুসলিম বাঙালি সংস্থা মুসলিম জীবন রূপায়ণের জন্য এতগুলি দামি পুরস্কার দিচ্ছে এ-ও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বাস্তবিক, ওটিই ছিল সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে দামি পুরস্কার। ২৯ মার্চ ২০০৮ পুরস্কারগুলি প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গৌরকিশোর ঘোষের পুরস্কার সরাসরি তাঁর পরিবারকে না দিয়ে অন্য কোনো ব্যবস্থা হয়েছিল।

২৩ অক্টোবর ২০০৮ সাহিত্য অকাদেমির 'লেখকের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে একক আসরে আমন্ত্রিত হয়ে সিরাজ নিজের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বলেন। রাজ্যের প্রধান পুরস্কারগুলির মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্র পুরস্কার তাঁর পাওয়া হয়নি কারণ ১৯৮২ সালে কথাসাহিত্যের জন্য বঙ্কিম পুরস্কার চালু হওয়ার পর থেকেই মনে হয় রবীন্দ্র পুরস্কার কবিদের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়।

ডিলিট সম্মান

যে মানুষটি কোনো রকমে বিএ পাস করেছেন, করেছেন বা করেননি তা নিয়েও প্রশ্ন, নিজের জীবনে প্রথাগত শিক্ষার দিকে যাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল না, সেই তাঁকেই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ ডিগ্রি দিয়েছে, এ কিছু কম পাওয়া নয়! ডিলিট মানে হল ডক্টর অব লেটার্স। আক্ষরিক অনুবাদে, শব্দবৈদ্য বা অক্ষরবৈদ্য। বাস্তবিক, শব্দ নিয়ে তাঁর অতিরিক্ত সচেতনতা, এই বিষয়ে পত্রপত্রিকায় ঘন ঘন চিঠি দেওয়া নিয়ে কিছু মানুষ তাঁকে এই নামই দিয়েছিলেন। আর, ২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দিল সাম্মানিক ডিলিট। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, গলায় উত্তরীয় ঝুলিয়ে, ঈষৎ নত হয়ে, ততটাই নত আচার্য-রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির হাত থেকে সম্মানপত্র নিচ্ছেন, সেই ছবি *অর্কেস্ট্রার* সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা[৬৫]য় ছাপা হয়েছে। সম্প্রতি ২০১৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডিলিট পেয়ে সিরাজের চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোটো মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)-এর প্রতিক্রিয়া, 'এতদিন বহু তিরস্কার জুটেছে, আজ যথার্থ পুরস্কার পেলাম।'[৬৬] প্রাপকদের চোখে এবং সমাজে এই সম্মানের কী মূল্য তা ওঁর মতো জনপ্রিয় লেখকের কথাতেও বোঝা যায়।

পিতা-পুত্রের দেখা হত। সফল পুত্রের কথা পিতা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং প্রয়োজনে নিজের মতামত দিতেন।[৬৩] এলাকায় ফেরদৌসী মৌলবি সাহেব নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি সত্যিকার মৌলবি ছিলেন না। খালেদ নৌমান বলেন, পিতাকে তিনি কোনোদিন নমাজ-রোজা করতে দেখেননি। পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন।[৬৪] কিন্তু ফেরদৌসীর চতুর্থ পুত্র যিনি পিতার সঙ্গে গ্রামেই থাকতেন অন্য কথা বলেছেন। পিতা নমাজ পড়তেন, এমনকি গ্রামের জুমা মসজিদে এমামতি পর্যন্ত করেছেন। মা-ও নাকি নমাজ পড়তেন। যখন তাঁর সঙ্গে এই লেখকের কথা হচ্ছিল, তখন পাশ থেকে তৃতীয় পুত্র শামসুল আজাদ প্রতিবাদ করেন। দুজনেরই আশির উপর বয়স, স্মৃতি প্রতারণা করতেই পারে। তবে চতুর্থ পুত্র মতীন হায়দারকে মনে হল খুব প্রত্যয়ী। পিতা চাকরি করতেন কি না জিজ্ঞেস করায় বলেন, নবগ্রামে পাট নিয়ন্ত্রণ দফতরে চাকরি করতেন। দেশভাগের পর অপশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। যশোরে কিছুদিন কাজও করেছেন। কিন্তু কোনো কারণে চাকরি ছেড়ে ফিরে আসেন। এইজন্যই, সরকারি চাকরি করলেও অবসরভাতা পেতেন না। এসব তথ্যই অবশ্য তৃতীয় পুত্র শামসুল আজাদ জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেন। তবে একদম চাকরি করতেন না এটা তো হতে পারে না, নইলে সংসার চলত কী করে! তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তাম্রপত্র পেয়েছিলেন সেটা অবশ্য দুজনেই বললেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খোশবাসপুরের গ্রামের বাড়িতেই তিনি প্রয়াত হন। প্রায় ১০২ বছরের আয়ু। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে জীবনের একশো বছর পুরো করতে পেরেছেন এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। এই মুহূর্তে একমাত্র *সওগাত*-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নামই মনে পড়ছে, যিনি তাঁর চেয়েও বেশি ১০৫ বছর বেঁচে ছিলেন। নিজের বাড়ির বাগানেই ফেরদৌসী ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী একলিমা বেগমের পাশাপাশি কবর।

পুরস্কারের বন্যা

সিরাজের মতো এমন বহু পুরস্কৃত লেখক খুব কমই আছেন বাংলা সাহিত্যে। ছোটো-বড়ো অজস্র পুরস্কার ও সংবর্ধনা পেয়েছেন, যার সম্পূর্ণ তালিকা মনে হয় কারও কাছেই নেই। আনন্দ, ভূয়ালকা, বঙ্কিম, অকাদেমি, ওইউএফ ইত্যাদি যেগুলির কথা আগেই লিখেছি তা বাদে বাকি পুরস্কারগুলি হল: ১৯৯৫—নতুন গতি (নতুন গতি সাহিত্য পুরস্কার), ১৯৯৯—শরৎ সমিতি (শরৎ পুরস্কার), ২০০০—শৈলজানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতি (শৈলজানন্দ শতবর্ষ স্মারক সম্মান), ২০০৩—*বুলবুল* পত্রিকা ও সেবক সাহিত্য সংসদ (সম্প্রীতি পুরস্কার), শচীন্দ্রনাথ সাহিত্য সংসদ (শচীন্দ্রনাথ সাহিত্য পুরস্কার), ২০০৫—*কিশোর ভারতী* (দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার), ২০০৭—*দক্ষিণী বার্তা* (সংবর্ধনা), ভারত সরকার (শিশুসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার), হলদিয়া উৎসব কমিটি (অন্নদাশঙ্কর রায় পুরস্কার), ২০০৮—ডা. বি সি রায় মেমোরিয়াল সোসাইটি (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড), দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি পুরস্কার), ভাষা শহিদ স্মারক সমিতি (বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব সম্মান), শিশু কিশোর আকাদেমি (শিশু কিশোর উৎসব সংবর্ধনা), ২০০৯—পশ্চিমবঙ্গ

উপচে পড়া সম্মান

'পৌষের ধান কাটার মাঠে সোনার আলো উপচে উঠবে'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনের প্রথম ৩৪-৩৫টা বছর যদি হয় বীজ বপনের সময় অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাল, তা হলে পরের ২৯ বছর ফসল ফলানোর সময়। *আনন্দবাজার* থেকে পূর্ণ অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত, তিনি তাঁর সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময় কাটিয়েছেন। এই কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ও প্রধান প্রধান বইগুলি। ওই সময়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৩১। এরপর জীবনের শেষ ১৯টি বছর গোলায় ফসল তোলার সময়। এই সময়েই শীর্ষ সম্মানগুলি পেয়েছেন। তুলনায় কম, তা-ও প্রকাশিত হয়েছে মোট ৯০টি বই। এর মধ্যে অবশ্য অনেকগুলিই পূর্ব প্রকাশিত লেখার সংকলন এবং কর্নেল ও রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয়। এমনিতে গোলা ভরেছে, কিন্তু তখন হয় শূন্য মাঠ, নয়তো পরিপূরক চাষ। নিজেই স্বীকার করেছেন, '*আনন্দবাজারে* যতদিন চাকরি করেছি, প্রচুর লিখেছি। রবিবারের পাতায়, *দেশ* পত্রিকায়। তারপর আর ইচ্ছে করে না। শরীর নেয় না। প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন এখন শোধ তুলছে শরীরে।'[১]

সেকাল একাল

যখন যৌবন ছিল, চাকরি পাকা হয়নি, তখনও বাড়িতে তরুণ লেখক, প্রকাশক, পত্রিকা সম্পাদক, নামি লেখক ও বন্ধুবান্ধবদের আসাযাওয়া লেগেই থাকত।[২] পরে যখন আরও সুনাম ছড়াল গ্রামের বাড়িতে গেলেও বহু লোকজন দেখা করতে আসতেন। গ্রামবাসীরা তো আসতেনই, সেইসঙ্গে সরকারি কর্তাব্যক্তি, শহরের লেখকরা, এমনকি কলকাতা থেকেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, শেখর বসু, অমর মিত্র এরকম আরও অনেকেই সেখানে গিয়েছেন।[৩]